৪. সপ্তদশ শতকের অর্থনীতি

ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের অর্থনীতিকে ঠিক সমৃদ্ধিশালী বলা চলে না। কিন্তু দিন এনে দিন খাওয়ার মতো বা জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি কিছু ছিল না, এমনটি মনে করারও কোনো কারণ নেই। এই সময়ের অর্থনীতিকে সচ্ছল বললে বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না। এই শতকে ব্যবসাবাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল এবং তা ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হচ্ছিল। সমাজে ব্যবসায়ী ও বণিকদের গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি বাড়ছিল। পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এর ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের বিলাসসামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছিল। বস্ত্রবয়ন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছিল। প্রচুর পরিমাণে সোনারুপো আমদানির ফলে মুদ্রার জোগান বেড়েছিল। লোকের হাতে পয়সা এসেছিল; ভোগাপণ্য কেনার মতো অর্থ অনেকের হাতে ছিল। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ঋণ গ্রহণের সুযোগ বাড়ছিল এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগও বাড়ছিল। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছিল। ষোড়শ শতকের এইসব উন্নতি সত্ত্বেও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউরোপ তখনও অনেক পিছিয়ে ছিল। ফলে আরাম ও প্রাচুর্যের সুযোগ ছিল না। তখনও পর্যন্ত কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান উপজীবিকা। কৃষি-উৎপাদনপদ্ধতি ছিল মান্ধাতার আমলের। কৃষকরা তখনও পর্যন্ত মূলত ভোগের জন্যই বা অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য উৎপাদন করত। বাজারের কথা মাথায় রাখা হত না। শিল্পে হাতের দক্ষতাই ছিল প্রধান ভরসা। আধুনিক যন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। যানবাহন ছিল শ্লথ গতির। ব্যবসাবাণিজ্যে ছিল প্রচণ্ড ঝুঁকি। কাজেই এই প্রকার অর্থনীতিকে ঠিক উন্নত বা অগ্রসর বলা চলে না।

সপ্তদশ শতকের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে ইউরোপে সম্পদের বণ্টন সুষম ছিল না। বাণিজ্যে ও শিল্পে উন্নত পশ্চিম ইউরোপ ছিল পূর্ব ইউরোপের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে। এক্ষেত্রেও আবার আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলি ছিল পুঁজির বিকাশের প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব ইউরোপ ছিল কৃষিতে অগ্রসর। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সম্পদের বণ্টনেও ছিল ব্যাপক বৈষম্য। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল দূরতিক্রম্য। শাসক শ্রেণি, অর্থাৎ রাজা-মহারাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায় বা ভূস্বামীদের বিলাসবহুল জীবন ও প্রাচুর্য সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। সমাজে যারা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করত, যেমন ছোটোখাটো সম্পত্তির মালিক, স্বাধীন ও সম্পন্ন কৃষক, দোকানদার, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ইত্যাদি, তারা মোটের উপর সচ্ছল ছিল। কিন্তু তারা তাতে খুব একটা সুখী ছিল না। তাদের অর্থের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং উপরতলার বড়োলোকদের জীবনযাত্রা তারা অনুকরণ করত। সমাজের অর্ধেকের বেশি মানুষ সম্পত্তির অধিকারী ছিল না। সমাজের সেইসব নীচু তলার মানুষ, ভূমিহীন কৃষক, খেটে খাওয়া মজুর, ভূমিদাস, বেকার, ভবঘুরে—যা হোক করে দিন গুজরান করত। ১৫৫৯ সালে তাদের যে অবস্থা ছিল, ১৭১৫ সালে তা তার চেয়েও খারাপ হয়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ

Scanned with CamScanner

শতকের আর একটি বৈশিষ্ট্য, এই সময়ের অর্থনীতিতে নগররাষ্ট্রের পরিবর্তে স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৪.ক. জনসংখ্যা

চতুর্দশ শতকে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণের ফলে প্রায় একশো বছর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই ধারা পরবর্তী একশো বছর অব্যাহত ছিল। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের জনসংখ্যা ১০০ মিলিয়নের বেশি ছিল মনে করা হয়। প্রসঙ্গত বলি, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদমশুমারি বলে কিছু না থাকায় জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। তাই আমাদের অনেকটাই অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হত বলে বা কর আদায়ের বিল থেকে, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ বা ব্যাপ্টিজমের হিসাব থেকে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু এগুলি থেকেও আমরা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারি না। যাই হোক, ১৫৯০ সাল নাগাদ ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থমকে দাঁড়ায়। সারা সপ্তদশ শতক জুড়ে জনসংখ্যা খুব ওঠানামা করতে থাকে। অনেক দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ হঠাৎ কমে যায়। তারপর আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তার উন্নতি হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ জার্মানির কথা বলা যায়। ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময় জার্মানির জনসংখ্যা চল্লিশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তা দ্রুত পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। ১৫৯০ থেকে ১৬৬৫ সালের মধ্যে স্পেনের জনসংখ্যা এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু পরে তা আবার সমান সমান হয়ে যায়। ১৫৯০ থেকে ১৭১৫ সালের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যা বারবার কখনও কমেছে, আবার কখনও বেড়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয়নি। এই শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ত্রিশ শতাংশ বেড়েছিল। সব মিলিয়ে বলা যায় ১৫৯০ সালে ইউরোপের যে জনসংখ্যা ছিল, ১৭১৫ সালে তার থেকে বেশি কিছু বাড়েনি; বরং সম্ভবত কিছু কমেছিল। অর্থাৎ ষোড়শ শতকে জনসংখ্যা বাড়লেও সপ্তদশ শতকে তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল।

ষোড়শ শতকে কেন জনসংখ্যা বেড়েছিল, বা ১৫৯০ সালে কেন তার গতি রুদ্ধ হল, বা সপ্তদশ শতকে জনসংখ্যা কেন ওঠানামা করেছিল—এসব প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব আমাদের জানা নেই। তবে এই শতকে মৃত্যুহারের ওঠানামা থেকে এইসব প্রশ্নের কিছুটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। জন্মহার এই সময় অনেক নিয়মিত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে জন্মহার যথেষ্ট বেশি ছিল। প্রতি হাজারে এই হার ছিল ৩৫-৪০। স্বাভাবিক সময়ে জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি ছিল। ১৫৮০-এর দশকে যুদ্ধ, মহামারি ও দুর্ভিক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দিলেও তা বন্ধ করতে পারেনি। তারপর এইসব বিপর্যয় ঘনঘন ও ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে। ১৫৯০-এর দশক ছিল পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী এবং একটি সন্ধিক্ষণ। এই দশকে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে স্পেন এবং হাংগেরি থেকে আয়ারল্যান্ড—সর্বত্র ব্যাপক খাদ্যহানি ঘটে। এর জন্য অবশ্য প্রকৃতি দায়ী ছিল। ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধপরিস্থিতি অবস্থা আরও সংকটজনক করে তোলে। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা স্পেনীয় নেদারল্যান্ডসে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। প্যারিসেও খাদ্য পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ১৫৯০ থেকে ১৫৯৩ সালের মধ্যে ফ্রান্সে গমের দাম পাঁচ গুণ বাড়ে। এই অবস্থায় ফ্রান্সের জনসংখ্যা পনেরো শতাংশ হ্রাস পায়। জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য বারবার এই ধরনের সংকট দায়ী ছিল। একশো বছরের

জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ : খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ

Scanned with CamScanner

মধ্যে অন্তত চারবার অনুরূপ সংকট দেখা গিয়েছিল। সেই দশকগুলি হল ১৬২০, ১৬৪০, ১৬৯০ এবং ১৭১০। ১৬৯৩-৯৪ সালে ফ্রান্সে ব্যাপক খাদ্যহানি ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের কোনো একটি অঞ্চলে খাদ্যাভাবের পর এক বছরের মধ্যে মৃত্যুহার স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আরও লক্ষ করার বিষয় এই যে, স্বাভাবিক সময়ে যারা মারা যেত, তাদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল হয় বৃদ্ধ নয় শিশু। কিন্তু ১৬৯৩-৯৪ সালে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের অর্ধেক ছিল শক্তসমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। এর ফলে জন্মহারও কমে যায়। এই সময় জন্মহার স্বাভাবিকের তুলনায় অর্ধেকের কম ছিল। পরের দিকে, অর্থাৎ ১৬৯৫-৯৬ সালে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। তবে দুর্ভিক্ষের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

খাদ্যাভাবের ফলে সব সময় যে মানুষ অনাহারে মারা যেত তা কিন্তু নয়; আসলে এর ফলে মানুষ দুর্বল হয়ে যেত এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেত। ফলে তারা সহজেই রক্ত আমাশা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হত। তা ছাড়া মহামারিরূপে দেখা দিত টাইফাস ও প্লেগ। শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এইসব রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত এবং সবল-দুর্বল প্রায় কেউ এর হাত থেকে রেহাই পেত না। ১৫৬৫ সালে হামবুর্গ শহরে এক-চতুর্থাংশ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ১৫৭৫-৭৭ সালে ভেনিসের জনসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছিল। ১৬৫৬ সালে নেপ্‌ল্‌স হারিয়েছিল পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ। লন্ডনে প্রায় প্রতি বছরই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যেত। এইভাবে ১৫৬৩ থেকে ১৬৬৫ সালের মধ্যে লন্ডনে দু-লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু শহরে মানুষের ভিড় কমত না। গ্রাম থেকে বহু ভূমিহীন কৃষক ও গরিব মানুষ শহরে এসে ভিড় জমাত। ফলে সপ্তদশ শতকে নগরের সংখ্যা বেড়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ক্রমশ প্লেগের আক্রমণ কমে আসে ও তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহামারি

মহামারি ও দুর্ভিক্ষ ছাড়া আরও একটি কারণে জনসংখ্যা কমছিল। অনেক সময় খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। অর্থাৎ জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক ছাড়িয়ে গেলে খাদ্যাভাব দেখা দিত। পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের তুলনায় পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ এই বাড়তি মানুষের খাবার জোগাতে কিছুটা সক্ষম ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষে ইউরোপের প্রায় সব দেশই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফ্রান্সের পক্ষে কুড়ি মিলিয়ন ও ইটালির পক্ষে এগারো মিলিয়নের বেশি লোকের খাদ্য সংস্থান করা সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যা এই সীমা ছাড়িয়ে গেলে খাদ্যাভাব দেখা দিত। তখন জনসংখ্যা কমতির দিকে যেত। কিন্তু জন্মহার বেশি থাকায় আবার জনসংখ্যা বাড়ত এবং তা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে আবার সংকট দেখা দিত। এর ফলে জনসংখ্যা ওঠানামা করত। স্পেনে কিন্তু এই অবস্থা দেখা দেয়নি। তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতকে স্পেনের জনসংখ্যা কেন কমেছিল, তা বলা কঠিন। হয়তো স্পেন তার অর্থনীতিকে ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারেনি বলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। জার্মানিতে একই সঙ্গে ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ, মহামারি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা ও দুর্ভিক্ষ, সব মিলিয়ে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইটালির মতো এখানেও জন্মহার বেশি হওয়ায় এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং ১৬৪৮ সালের পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন

সপ্তদশ শতকে ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের কথা বলা যায়। এখানে ষোড়শ শতকে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালির তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম ছিল। তা ছাড়া উদ্বৃত্ত জনগণকে খাদ্য জোগানোর সামর্থ্য ইংল্যান্ডের ছিল। ফলে খাদ্যাভাব

Scanned with CamScanner

হয়নি। ওলন্দাজদের মধ্যেও জনসংখ্যা বেড়েছিল। তারা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য অর্থাৎ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। সপ্তদশ শতকে ইউরোপের মোট জনসংখ্যা না বাড়লেও উৎপাদন ক্ষমতা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। ১৭১৫ সালের পর জন্মহার বাড়ছিল। প্লেগের অবসান হয়েছিল। একটানা শস্য উৎপাদনও বাড়ছিল। মানুষের আয়ুও বাড়ছিল। অষ্টাদশ শতকে অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে জনসংখ্যা হ্রাস একটা সংকট সৃষ্টি করেছিল। তবে পূর্ব ইউরোপ এই সমস্যা থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল। এখানে জনসংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছিল।

৪.খ. কৃষি

উৎপাদন পদ্ধতি

উৎপাদনপদ্ধতিতে সপ্তদশ শতকে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল হল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। ওলন্দাজরা কৃষি ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে উৎসাহী ছিল। সাধারণভাবে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত ইউরোপের কৃষি ব্যবস্থা আরও বেশি করে বাণিজ্যসচেতন হয়েছিল এবং উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল। শহরের বাজারের কথা চিন্তা করে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করার প্রবণতা বাড়ে। গ্রামের ভূস্বামীরা নানাভাবে অর্থ উপার্জনের কথা চিন্তা করত। তারা কখনও খেতমজুরদের দিয়ে চাষ করাত, কখনও ছোটো ছোটো ভাগে জমি বিভক্ত করে কৃষকদের ইজারা দিয়ে দিত, আবার কখনও বা ভাগে জমি চাষ করানো হত। খাজনার বদলে ভাগচাষিদের কাছ থেকে জমির ফসলের অর্ধাংশ তারা দাবি করত। ফ্রান্সে ভাগচাষ ব্যবস্থাকে বলা হত "মেতায়াজ" (Metayage)। ইটালি ও স্পেনেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, হাংগেরি ও প্রাশিয়ায় ভূস্বামীরা মজুরি অথবা খাজনা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না। সাধারণত তারা সার্ফ বা ভূমিদাসদের দিয়ে সপ্তাহে তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে তাদের জমি চাষ করিয়ে নিত। এক কথায় বলা যায় শস্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পশ্চিম ইউরোপের কৃষকরা কোথাও দিনমজুরে, কোথাও ভাড়াটে প্রজায়, আবার কোথাও বা ছোটোখাটো স্বাধীন কৃষকে পরিণত হয়। আর পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র ও সার্ফপ্রথা জাঁকিয়ে বসছিল। বাজার অর্থনীতির দাপটে আগেকার সাবেকি সংঘবদ্ধ স্থানীয় স্বয়ম্ভরতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গ্রামসমাজ হারিয়ে যাচ্ছিল।

আগেই বলেছি উৎপাদনপদ্ধতি আগের মতোই ছিল। অর্থাৎ গ্রামের সমস্ত আবাদযোগ্য জমি তিনটি বড়ো ভাগে ভাগ করা হত এবং বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হত। একটি খণ্ড অবশ্য পতিত রাখা হত। প্রত্যেক খণ্ড অসংখ্য বা শতাধিক ছোটো ছোটো খণ্ডে আবার বিভক্ত করে ব্যক্তিগত জোত গঠন করা হত। প্রত্যেক খণ্ড অবশ্য একে অপর থেকে পৃথক করে চিহ্নিতকরণ হত। মধ্যযুগের মতো এই সময়েও একজনের হাতে একাধিক খণ্ড থাকত। কিন্তু সপ্তদশ শতকে কারও কারও হাতে অন্যদের তুলনায় বেশি খণ্ড থাকত। অল্প কয়েকজনের হাতে একশো একর বা তার চেয়ে বেশি জমি থাকত। বেশিরভাগের হাতে ছিল দশ থেকে বিশ একর জমি। এতে মোটের উপর একটি পরিবারের চলে যেত। সবচেয়ে গরিবের হাতে জমি না থাকলে সে প্রতিবেশীর জমি ভাড়া হিসাবে গ্রহণ করত। এই উৎপাদনব্যবস্থায় অবশ্য কিছু জমি নষ্ট হত। যাই হোক, এই ব্যবস্থা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। জমিতে লাঙল দেওয়া, বীজ বপন এবং শস্য কাটার পদ্ধতি দ্বাদশ শতক থেকে খুব একটা উন্নত হয়নি। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও বেশি হত

Scanned with CamScanner

না। উৎপন্ন ফসলেও কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। দানাশস্য, শুঁটি, ফল, সবজি ইত্যাদি একই ধরনের ফসল উৎপন্ন হত। খাদ্যবস্তুর মধ্যেও কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। নব আবিষ্কৃত দেশ থেকে আলু ও ভুট্টার সঙ্গে ইউরোপের মানুষ পরিচিত হলেও ইউরোপে এসবের চাষবাসের প্রচলন ছিল না। মশলা, চা, চিনি ও কফির জন্য ইউরোপের মানুষ এশিয়া ও আমেরিকার উপর নির্ভর করত।

সামগ্রিকভাবে ইউরোপ প্রসঙ্গে আলোচনার পর আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করব ইউরোপের কয়েকটি বিশিষ্ট দেশের দিকে। প্রথমে আসা যাক ইংল্যান্ডের কথায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডও ছিল একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং সাধারণভাবে ইংল্যান্ড খাদ্যে স্বনির্ভর ছিল। ১৬৬০ সালের আগে ইংল্যান্ডে খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছিল। ফলে মজুরির তুলনায় খাদ্যের দাম বেড়েছিল। এই অবস্থায় খাদ্য সমস্যা সমাধান করার জন্য কৃষকরা সাবেকি উৎপাদনপদ্ধতির সাহায্যেই খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছিল। উৎপাদনপদ্ধতি নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও চালানো হয়েছিল। নতুন নতুন জমিতে চাষবাস শুরু হয়। সপ্তদশ শতকের শেষে ইংল্যান্ডে কৃষকদের প্রায় অর্ধাংশ ছিল ছোটোখাটো কৃষক যাদের হয় নিজস্ব জমি ছিল, নয় অন্যের জমি দীর্ঘ ইজারায় চাষ করত। ফলে জমির উন্নতির জন্য তারা সচেষ্ট ছিল। কেমব্রিজ সন্নিহিত অঞ্চলে তারা জলাজমি পরিষ্কার করে তা আবাদজমিতে পরিণত করে। জঙ্গল সাফ করেও জমি তৈরি করা হয়। জমি যাতে উর্বর হয়, সেইজন্য অনেক সময় বাঁধ দিয়ে নদীর জল ধরে জমিতে পলিমাটির ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ জনসংখ্যা যেমন বেড়েছিল, বাড়তি খাদ্য জোগানের চেষ্টাও হয়েছিল। বস্তুত, খাদ্য উৎপাদন এত বেড়েছিল যে, এই শতকের শেষে ইংল্যান্ড থেকে গম রপ্তানি করা হত। গাজর, শালগম প্রভৃতি নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের দিকেও নজর দেওয়া হয়।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডে অধিকাংশ জমির মালিক ছিল সরকার (সরকারি জমিকে বলা হত crown land), চার্চ ও মঠ, এবং বড়ো ভূস্বামী। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে সরকার বাড়তি খরচ মেটাতে অনেক সময় জমি বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। চার্চও অনেক জমি হারায়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মঠ ব্যবস্থার (Monasticism) বিলোপ ঘটায় মঠ বহু জমি হারায় এবং সেইসব জমি ভূস্বামীরা কিনে নেয়। এর ফলে ইংল্যান্ডে এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণির উদ্ভব হয়, যাদের বলা হত "জেন্ট্রি" (gentry)। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এই শ্রেণির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। ষোড়শ শতকে এরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ জমির মালিক ছিল। ১৭০০ সালের মধ্যে তাদের জমির পরিমাণ বেড়েছিল ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ একর। এরা জমিকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে কী করে আরও আয় বাড়ানো যায়, সেদিকে নজর দেয়। কৃষিযোগ্য জমিকে চারণজমিতে রূপান্তরিত করে তারা মুনাফা অর্জনের দিকে মন দেয়। ভূস্বামীরা তাদের প্রজাদের প্রায় অর্ধ-মিলিয়ন একর জমি থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে মেষপালন শুরু করে। তবে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের আগে এই আন্দোলন (Enclosure Movement) পুরোপুরি সংগঠিত হয়নি। অন্যদিকে এইসব ভূস্বামী কেবল পশম উৎপাদনের দিকেই নজর দেয়নি। কৃষির উন্নতি নিয়েও তারা ভাবনাচিন্তা করেছিল। তাদের হাতে বেশি পয়সা থাকায়, তাদের পক্ষে এই কাজ অনেক সহজ ছিল। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে তারা পশুপালনে উৎসাহী হলেও এই শতকের শেষ দিকে এবং সপ্তদশ শতকের গোড়ায় তারা শস্য উৎপাদনেই বেশি আগ্রহী হয়; কারণ তখন খাদ্যের চাহিদা বাড়ছিল, দামও বাড়ছিল। পশুপালন অবশ্য বন্ধ হয়নি, কারণ শহরে মাংস ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর চাহিদা ছিল। ১৬৫০-এর পর থেকে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

Scanned with CamScanner

স্পেন

স্পেনের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কৃষি উৎপাদন কমেছিল। ইংল্যান্ডের মতো স্পেনেও পশম তৈরির জন্য আবাদযোগ্য জমিকে গোচারণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়। এখানে জনসংখ্যার মাত্র তিন শতাংশ মানুষ সাতানব্বই শতাংশ জমির মালিক ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাই ভূস্বামীদের পক্ষে বেশি পরিমাণ জমিতে পশুপালন করা সম্ভব ছিল। ষোড়শ শতকের গোড়ায় মেস্তা (Mesta) বা মেষপালক সমিতির সদস্যরা প্রায় তিন মিলিয়ন অতি উৎকৃষ্ট মানের ভেড়ার মালিক ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এতগুলি মেষ চরাতে প্রচুর জমির দরকার হত। স্পেনের সরকার মেস্তার পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দিত। আগে যেসব জমিতে শস্য উৎপাদন হত, সেগুলিকে দরাজভাবে পশুচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। এমনিতেই স্পেনের জমি ছিল অনুর্বর। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ে। কৃষকরা কাজের সন্ধানে শহরে ভিড় জমায়। স্পেনে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আক্ষেপের বিষয়, সপ্তদশ শতকে পশুপালনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং কৃষিই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু এখানকার অধিকাংশ খেতই ছিল আয়তনে ছোটো। সপ্তদশ শতকে পঁচাত্তর শতাংশ কৃষকেরই পর্যাপ্ত জমি ছিল না। ফলে তা থেকে তারা যে শস্য উৎপাদন করত, তাতে তাদের খুব কায়ক্লেশে দিন চালাতে হত। তাই নিজেদের একচিলতে ছোটো জমি ছাড়া তারা অনেক সময় অন্যের জমিতে, যে হয়তো দূরে কোনও শহরে বা গ্রামে বাস করে এবং যার পক্ষে নিজ জমি চাষ করা অসম্ভব, ভাড়াটে হিসাবে চাষ করতে বাধ্য হত। চাষের উৎপাদনসামগ্রীও ছিল অনুন্নত। এক কথায় এরা খুব গরিব ছিল। আবার কিছুসংখ্যক কৃষক ছিল, যাদের জমির আয়তন ছিল মাঝারি মাপের। এরা মোটের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তাদের নিজস্ব পশু চরানোর জমি, ফলের বাগান, আঙুর খেত ইত্যাদি ছিল। পরিবারের সবাই মিলে এসব কিছু দেখাশোনা করত। অনেক সময় শহরের ধনী মানুষ গরিব চাষিদের কাছ থেকে জমিজমা কিনে বড়ো মাপের খেতখামার তৈরি করত। অল্পসংখ্যক সম্পন্ন কৃষকও এইভাবে নিজেদের জমিজমার আয়তন বাড়াত। এইসব ক্ষেত্রে ভাগচাষিদের দিয়ে জমি চাষ করানো হত। জমির মালিক বীজ ও চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ জোগান দিত। চাষি দিত তার শ্রম। দক্ষিণ ফ্রান্সে এই ব্যবস্থার প্রচলন বেশি ছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সের কৃষকদের মধ্যে দারিদ্র্য ছিল প্রকট এবং অনেকেই জীবনধারণের নূন্যতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম ছিল। অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা ছিল ফ্রান্সের অর্থনীতির দুর্বল দিক। সপ্তদশ শতকের গোড়ায় অবশ্য উন্নয়নের কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা করেছিল। ষোড়শ শতকে বাজরা ও ভুট্টা—এই দুটি নতুন ফসলের উৎপাদন শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিকে পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যেত।

সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে প্রায়ই খাদ্যাভাব দেখা দিত। কখনও তা জটিল হয়ে বড়ো ধরনের ঘাটতিতে পরিণত হত। অবস্থা খুব খারাপ হলে হত দুর্ভিক্ষ। এই ধরনের ঘটনা বিরল ছিল না। ১৬৮০-এর দশকে, ১৬৯৩-৯৪ এবং ১৭০৯-১০ সালে ব্যাপক খাদ্যসংকট দেখা গিয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এই শতকের গোড়ার দিকে কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনও বেড়েছিল। এই সময় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছু চেষ্টাও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই অবস্থার অবনতি শুরু হয়। কৃষিতে এই অবক্ষয় ১৭১৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ব্রেনারের (R. Brenner) মতে, ছোটো কৃষকের সংখ্যাধিক্যই ফ্রান্সে কৃষিতে অনগ্রসরতার কারণ। আসলে ইংল্যান্ড যেমন সপ্তদশ শতকের পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিল এবং

Scanned with CamScanner

কিছুকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, ফ্রান্স তা পারেনি। দারিদ্র্য ও করভারে জর্জরিত কৃষকদের পক্ষে এই অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে কৃষি-অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল শ্যাম্পেনে (Champagne) আঙুর চাষ। জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশ এখানে এক বিশেষ ধরনের আঙুর চাষের অনুকূল ছিল। সপ্তদশ শতকে আঙুর চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ফ্রান্সের তৈরি মদের খ্যাতি ছিল সারা ইউরোপ জুড়ে। প্যারিস ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল ছিল মদ তৈরির জন্য বিখ্যাত; যদিও সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স জুড়েই মদ তৈরি হত। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আঙুরের চাষ হত। শ্যাম্পেনের তৈরি মদ এত বিখ্যাত ছিল যে, স্বয়ং ফরাসিরাজ চতুর্দশ লুই তা পান করতে ভালোবাসতেন। ইংল্যান্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস যুবা বয়সে ফ্রান্সে ভ্রমণ করতে এসে এই সুধারসে আসক্ত হয়ে ইংল্যান্ডে তার প্রচলন করেন।

ইউরোপের মধ্যে হল্যান্ডের কৃষকরা ছিল সবচেয়ে বেশি উদ্যমী ও কৃষির উন্নতি নিয়ে তারা খুব ভাবনাচিন্তা করত। অবশ্য এটা তারা করত কিছুটা বাধ্য হয়ে। আসলে ঘন বসতিপূর্ণ এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্য সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব ছিল। উত্তর সাগরের জলে জমি প্রায়ই প্লাবিত হত। সাগর থেকে জমি উদ্ধার করে উইন্ডমিল বা হাওয়াকলের সাহায্যে তা শুকিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হত। জমির অভাবে এখানকার চাষিরা নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করত। ১৬২০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থার বহুল প্রচলন ছিল। যেসব জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযুক্ত ছিল না, সেসব জমিতে শন, ফল, ফুল, বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় লতাপাতা ইত্যাদির চাষ করা হত। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তারা এক ধরনের কৃত্রিম ঘাসের চাষ শুরু করে। এই ঘাস দ্রুত বেড়ে উঠত এবং মাঠ ভর্তি হয়ে যেত। এখানে পশু চরানো হত। এই ঘাস একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করত, অন্যদিকে তেমনই পশুপালনের ফলে সারের কোনো অভাব হত না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চাষবাসের পাশাপাশি পশুপালনের জন্য হল্যান্ডে দুগ্ধজাত সামগ্রীও তৈরি হত এবং গ্রামে যেমন কৃষকরা বাস করত, তেমনই যারা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরি বা তার ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল, তারাও একসঙ্গে থাকত। এখানকার তৈরি মাখন ও পনির বিদেশে রপ্তানি করা হত। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে শীতকালে পশুখাদ্যের অভাবে পশুদের মেরে ফেলা হত। ফলে এই দিক থেকে ইংল্যান্ড হল্যান্ডের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে স্পেন যদি হল্যান্ডকে অনুকরণ করতে পারত, তাহলে তারও অর্থনীতি কিছুটা উন্নত হত। আসলে এখানেই হল্যান্ডের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তফাত গড়ে উঠেছিল।

হল্যান্ড

কৃষি ইউরোপের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা হলেও এবং কোথাও কোথাও কৃষির পাশাপাশি পশুপালন হলেও, যেসব এলাকা নদী বা শহর থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, যেমন দক্ষিণ ইটালি ও কাসটাইল, সেখানে পশুপালনই ছিল প্রধান উপজীবিকা। এ ছাড়া পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে পশুপালন করা হত। এইসব পশুপালক বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে পশুপালন করত।

৪.গ. শিল্প

শিল্পের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য চোখে পড়ে। ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড শিল্পে অগ্রসর ছিল। কিন্তু ইটালি ও আইবেরীয় উপদ্বীপ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। অন্যদিকে এই শতকে উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃহৎ আকারে

Scanned with CamScanner

পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছিল। উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় গ্রাম ও শহর পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রামের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল এবং অনেক কিছু গ্রামেই উৎপন্ন হত। কর সংক্রান্ত নথি থেকে জানা যায় গ্রামের এক-ষষ্ঠাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অকৃষি উৎপাদনে, বিশেষত বস্ত্রবয়ন শিল্পে, নিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাধীনভাবে গ্রামের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে বা গ্রামীণ বাজারের দিকে তাকিয়ে উৎপাদন করত। অনেকে আবার অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কাজ করত এবং গোটা কাজের একটা সামান্য অংশ করে দিত। বাকিটা শহরের কারিগররা করত এবং তাদের তৈরি জিনিস দূরদূরান্তের বাজারে বিক্রি হত। গ্রামীণ উৎপাদনে খরচ বা উৎপাদন ব্যয় কম হত এবং তা গিল্ডের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিল। কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ জোগান দিত উৎপাদক নিজে।

সপ্তদশ শতকে শিল্পের লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক বা প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন। বস্ত্র ছিল সবচেয়ে মৌলিক উৎপাদন সামগ্রী। মধ্যযুগের মতো সপ্তদশ শতকে এটিই ছিল প্রধান শিল্পোদ্যোগ। বস্ত্রবয়ন শিল্পে ষোড়শ শতকের গোড়ায় যে উৎপাদন কৌশল ছিল, সপ্তদশ শতকে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। পশম বস্ত্র পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র উৎপন্ন হত। বড়ো বড়ো উৎপাদকরা গ্রামের কৃষকদের দিয়ে সুতো তৈরি ও বোনার কাজ করিয়ে নিত। অনেক প্রস্তুতকারক তৈরি করা পোশাক রং করাত না, কারণ রং করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হত। তাই রঙিন কাপড়ের দাম ছিল চড়া। পশম রং করার কাজে সবচেয়ে দক্ষ ছিল ওলন্দাজরা। স্বভাবতই তারা এই দক্ষতা গোপন রাখত। তারা ইংল্যান্ড থেকে সাদা কাপড় এনে রং করত। উদ্যমী ও উদ্যোগী প্রস্তুতকারক কাঁচা রেশম কিনে তা থেকে এমন কাপড় তৈরি করত, যা দেখে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। এর জন্য তাকে কয়েকশো নারী ও পুরুষ কর্মী নিযুক্ত করতে হত এবং কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হত। এখনকার অনেক কারখানায় যেমন বিভিন্ন জিনিস একত্র করে বা জুড়ে একটি দ্রব্য তৈরি করা হয়, এদের উৎপাদন সংগঠন ছিল অনেকটা সেইরকম। তবে উৎপাদন হত সাবেকি পদ্ধতিতে এবং কারিগররা সবাই দক্ষ ছিল না।

বস্ত্রবয়ন শিল্প

পশমবস্ত্র ছিল প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আর রেশমবস্ত্র ছিল বিলাসসামগ্রী। রেশমবস্ত্র তৈরি হত শহরে। এই কাজ করত দক্ষ ও শিক্ষিত কারিগর-শিল্পী। এর জন্য প্রয়োজন হত বহুমূল্য কাঁচামাল। উৎপাদনপ্রক্রিয়া ছিল জটিল। রেশমবস্ত্র ও ভেলভেটের কাপড় কিনত একমাত্র ধনীরা। প্রস্তুতকারক তাই জোর দিত গুণগত মানের উপর। উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ বেশি হত না। ত্রয়োদশ শতক থেকে ইটালির লুক্কা (Lucca) ছিল এই শিল্পের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র। আরও উত্তরে ল্যন (Lyons) ও আমস্টারডাম (Amsterdam) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নত ও অগ্রসর ছিল।

শেষে আসা যাক দরজিদের কথায়। তাদের কাজ ছিল কাপড় সেলাই করে পোশাক তৈরি করা। স্বনিযুক্ত এইসব কারিগর ইউরোপের সব শহরেই বসবাস করত। চিরাচরিত পদ্ধতিতে তারা সেলাই-এর কাজ করত। তাদের নিজস্ব সংগঠন বা গিল্ড ছিল। গিল্ড নির্ধারিত মান অনুসারেই তারা কাজ করত। গ্রাহকদের কাছ থেকে যে দাম তারা আদায় করত, গিল্ডই তা স্থির করে দিত। পশমবস্ত্র প্রস্তুতকারক ও রেশমবস্ত্র ব্যবসায়ীরা অবশ্য এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ নীতি আদপেই পছন্দ করত না। তারা নিজেরা কিন্তু চাইত যে, সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুক এবং তাদের রক্ষা করতে বা তাদের স্বার্থ দেখতে সদর্থক ভূমিকা পালন করুক। ইংরেজ সরকার দেশের তৈরি পশম বিদেশে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছিল। অন্যদিকে বিদেশ থেকে আনা পশমের উপর চড়া হারে শুল্ক

Scanned with CamScanner

ধার্য করা হয়েছিল। সৈনিকদের পোশাক তৈরি করার জন্য দেশের "ওরস্টেড" ও "সার্জ" ব্যবহার করা হত।

সপ্তদশ শতকে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অল্প। কায়িক পরিশ্রম ছিল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ। যন্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত। যন্ত্রগুলিও ছিল সাধারণ মানের। আসলে শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত যন্ত্রের ভূমিকা ছিল প্রান্তিক। যন্ত্রের ব্যবহার কীভাবে উৎপাদনে যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে, তা শিল্পবিপ্লবের আগে বোঝা যায়নি। শুধু অনুন্নত মানের যন্ত্রই নয়, কারিগররাও বেশিরভাগ ছিল অদক্ষ। এই অবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু উৎপাদনের কথা ভাবা যায় না। অনেক সময়ই কৃষি ও শিল্পকর্ম এক সঙ্গেই চলত। প্রতি দশজন কারিগরের মধ্যে সাত থেকে আট জনই ছিল কৃষিশ্রমিক। কিন্তু উৎপাদন পর্যাপ্ত হত না বলেই সমাজের অধিকাংশ মানুষই ভালো করে খেয়ে পরে থাকত না।

সপ্তদশ শতকের ইউরোপে ইংল্যান্ডই ছিল শিল্পে সবচেয়ে অগ্রসর ও উন্নত দেশ। খনিজ সম্পদে ইংল্যান্ড সমৃদ্ধিশালী ছিল। উত্তর ইংল্যান্ডে টাইন (Tyne) নদীর তীর ধরে অনেক কয়লাখনি ছিল। খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ছিল এক এলাহি কাণ্ড। তবে সব কাজই হত হাতের সাহায্যে। কয়লা শিল্পে উন্নতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৫৫০-এর দশকে কয়লা উত্তোলন হত প্রতি বছরে প্রায় দু-লক্ষ টন। ১৬৮০-এর দশকে তা বেড়ে হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ টন। একই সময়ে ইংল্যান্ডে লোহার উৎপাদন বেড়েছিল পাঁচ গুণ। এই কয়লা কিন্তু ইট তৈরি বা অন্যান্য কিছু তৈরির কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত না। কয়লার সাহায্যে কীভাবে আকরিক লোহা গলাতে হয়, তা তখন ইংরেজরা জানত না। এই কাজে কাঠকয়লা ব্যবহার করা হত। কয়লা ব্যবহার করা হত শীতকালে ঘর গরম করার জন্য। আগে এর জন্য কাঠের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। লোহা ব্যবহার করা হত পাত্র, ছুরি, পিন প্রভৃতি গৃহস্থালিদ্রব্য তৈরি করার জন্য। ইংল্যান্ড লোহা ও ইস্পাত শিল্পে অগ্রসর হলেও জার্মানি, বোহেমিয়া ও হাংগেরিতে এই শিল্পের অবনতি হয়েছিল। কয়লা ও লোহা ছাড়া টিন, তামা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু থেকে নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈরি হত। ১৭০০ সাল থেকে সিসার উৎপাদন শুরু হয়। নুন, চুন ও সোরাও উৎপন্ন করা হত। ইংল্যান্ড

গণম উৎপাদন স্থিতিশীল হওয়ায় ইংল্যান্ড বস্ত্র উৎপাদনে মন দেয়। উৎপাদন খরচ কম থাকায় ইংল্যান্ডের কাপড় সস্তা দামে ইউরোপে বিক্রয় করা সম্ভব হয় ও সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ড ইউরোপের বাজার দখল করে নেয়। গ্রামাঞ্চলে এইসব কাপড় তৈরি হত এবং গ্রামে কারিগরদের মজুরি কম থাকার দরুন উৎপাদন খরচ কম হত। ইংল্যান্ডে শিল্প বিকাশের একটা বড়ো কারণ ঘরে বাইরে চাহিদা বৃদ্ধি। ইউরোপের অনেক দেশেই ইংল্যান্ডের তৈরি জিনিস বিক্রয় হত। দেশের মধ্যেও কিছু মানুষের হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় চাহিদা বেড়েছিল। অন্যদিকে খাদ্যের দাম পড়ার ফলেও মানুষের পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্য কেনা কিছুটা সহজ হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও চাহিদা বেড়েছিল। শিল্প বিস্তারের জন্য যে মূলধন বা পুঁজি ও উদ্যোগের প্রয়োজন হয়, তারও কোনও অভাব হয়নি। ঋণ পাওয়ার সুযোগ ছিল। কয়লা ও লোহা শিল্পে অর্থ জোগান দিতে এগিয়ে এসেছিল অনেক স্থানীয় ভূস্বামী। সরকারও উৎসাহের সঞ্চার করতে উদ্যোক্তাদের একচেটিয়া অধিকার দিয়ে সনদ মঞ্জুর করত। প্রথম জেমস কাচ, সাবান, ফটকিরি প্রভৃতি শিল্পে এইভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অনেক সময় বিদেশ থেকেও পুঁজি পাওয়া যেত। হল্যান্ড থেকে আগত কিছু মানুষ পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে উদ্যোগীর ভূমিকাও নিত।

Scanned with CamScanner

শিল্প ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের এই অগ্রণী ভূমিকার কথা মাথায় রেখে অধ্যাপক জন নেফ (John Nef) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ১৭৬০ সালের পরে ইংল্যান্ডে যেমন শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, তার আগে ১৫৪০ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যেও তেমনই অনুরূপ এক শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। অধ্যাপক রিচার্ড ডান মন্তব্য করেছেন—"But 'revolution' seems too strong a term for the industrial developments in Tudor and Stuart England."[১০] ইংল্যান্ডে অল্প পরিমাণ লোহা ও কয়লা উৎপন্ন হত এবং তা কখনোই উৎপাদনপদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। বস্তুত, প্রকৃত অর্থে শিল্পবিপ্লব তখন অনেক দূরে ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্পের জগতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তার সঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের শিল্পে অগ্রগতির কোনো তুলনাই হয় না। বস্ত্রশিল্পে কিছুকিছু কারিগরি পরিবর্তন হলেও অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবের পরিবর্তনের ধারে কাছে তা যেতে পারেনি। কাজেই নেফের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করা সম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে, এই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় শিল্পের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড অনেক এগিয়ে ছিল।

ফ্রান্স

শিল্পের দুনিয়ায় ফ্রান্স অবশ্যই ইংল্যান্ডের সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সকে ঠিক শিল্পে অনুন্নতও বলা অসংগত। যাই হোক, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে নগরগুলি ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হলেও মোটা ও খসখসে এবং সাধারণ মানের লিনেন ও পশমি পোশাক তৈরি হত গ্রামগুলিতে। ১৬৫০ সালের মধ্যে গ্রামীণ এই শিল্পসামগ্রী স্থানীয় প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বাইরে রপ্তানি করা হত। যানবাহন অপ্রতুল ও অনুন্নত হলেও ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব পোশাক বিক্রি হত। ফ্রান্সের উত্তরাংশই ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ল্যান-এর (Lyons) রেশম শিল্প ছিল খুব বিখ্যাত। ১৬২৫ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে পশম ও সুতি শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তারপর অবশ্য তার কিছুটা অবনতি ঘটেছিল। তবে ১৬৮০ সালের পর এই শিল্প আবার উন্নতির মুখ দেখেছিল।

সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সের মানুষ পশম ও লিনেনের বদলে সুতিবস্ত্রের দিকে বেশি ঝুঁকেছিল। কিন্তু নর্মান্ডি ও পিকার্ডির মতো শহরের গিল্ডগুলি তাদের পুরানো সংগঠন ও উৎপাদনপদ্ধতি বদলাতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা আগে যে ধরনের পোশাক তৈরি করত, তাই ধরে রাখতে চেয়েছিল। ফলে তারা ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারেনি। ফ্রান্সের বাজার সস্তার বিদেশি কাপড়ে ছেয়ে যায়। এই অবস্থায় ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর অর্থমন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) ১৬৬৪ সালে বিদেশি পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপান। এইভাবে অবস্থা কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য তিনি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হল্যান্ড ও ফ্ল্যান্ডার্স থেকে আসা কারিগরদের নর্মান্ডিতে স্বাগত জানানো হয়। ১৬৮০ সালের মধ্যে একজন দক্ষ কারিগরের নেতৃত্বে ছোটো কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়। পুঁজির জোগান দিত বণিকরা। উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় বেতনভুক কর্মচারী বা জার্নিম্যান। কিছু কাজ অবশ্য গ্রামেই করানো হত। শহরগুলি সাধারণ মানের কাজ গ্রামের কারিগরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পশম, রেশম এবং ভেড়া ও উটের লোম মিলিয়ে বিলাসী ও চোখধাঁধানো পোশাক তৈরি করতে থাকে। ১৬৬০-এর পর থেকে নর্মান্ডি ও শ্যাম্পেনে সস্তার কাপড় তৈরি হতে থাকে। অন্যদিকে ষোড়শ শতকে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসা-দখলকারী ল্যাংডক (Languedoc) ১৬৪০ ও ১৬৫০-এর দশকে অধঃপতনের সম্মুখীন হয়।

Scanned with CamScanner

হল্যান্ড ও ইংল্যান্ড পশম শিল্পে অগ্রসর হলেও ফ্রান্স উচ্চমানের লিনেন ও ক্যানভাস তৈরি করত। এই ধরনের সবচেয়ে ভালো কাপড় তৈরি হত রুয়েনে (Rouen)। ব্রিটানিতে (Brittany) যে বিভিন্ন ধরনের লিনেন তৈরি করা হত, তা বাইরে রপ্তানি করা হত। আনজুতে (Anjou) তৈরি হত ক্যানভাস। গ্রামের শিল্পীরাই এইসব জিনিস তৈরি করত। রেশম শিল্প ছিল পুরোপুরি শহরকেন্দ্রিক। বস্ত্রবয়ন শিল্প ছাড়া কাগজ, কাচ, চামড়ার তৈরি জিনিসও ফ্রান্সে উৎপন্ন হত। ফরাসি শিল্পোদ্যোগে কোলবার্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে তিনি বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে যতটা উৎসাহ দিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিস উৎপাদনে তা দেননি। ফলে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করার পরে এইসব শিল্পের পতন হয়।

হল্যান্ডের শিল্পোদ্যোগের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সপ্তদশ শতকে ব্যবসাবাণিজ্যেই তাদের নামডাক ছিল বেশি। কৃষি ও শিল্পকে তাদের সাফল্যের সূচক বলে মনে করা হত না। অনেকেরই ধারণা ব্যবসাবাণিজ্যে অগ্রসর হলেও হল্যান্ড শিল্পে পিছিয়ে ছিল। এই ধারণা যথার্থ নয়। কৃষি ও শিল্পেও হল্যান্ড যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। কিন্তু শিল্প উন্নয়নে ওলন্দাজদের সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল কাঁচামালের অভাব। এর জন্য তাদের আমদানির উপর নির্ভর করতে হত। ফলে তাদের শিল্প প্রচেষ্টা অনেকটাই দাঁড়িয়ে ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের উপর। আসলে তাদের কাজ ছিল অনেকটা দালালের মতো। তারা একইসঙ্গে ক্রয় ও বিক্রয় করত। অন্যের দ্রব্য নিয়েই ছিল তাদের কাজকারবার। তারা এশিয়া থেকে কিনত মশলা, চা ও তুলো; আমেরিকা থেকে কিনত চিনি, তামাক ও ফার; উত্তর ইউরোপ থেকে হল্যান্ডে আসত শস্য, গবাদি পশু, তামা ও কাঠ; দক্ষিণ ইউরোপ জোগান দিত পশম, রেশম, মদ ও রুপো। এসব কিছু কিনে ব্যবসায়ীরা আমস্টারডাম ও হল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে জড়ো করে সারা ইউরোপের ক্রেতাদের বিক্রি করত। দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত এইসব কাঁচামালকে তারা শিল্পসামগ্রীতে পরিণত করত এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। তাদের বস্ত্রবয়ন শিল্প ছিল যথেষ্ট উন্নত। কাপড় রং করার কাজে তাদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। মদ, চামড়াজাত দ্রব্য, চিনি, নুন, তামাক, সাবান প্রভৃতি ছিল তাদের প্রধান শিল্প। কিন্তু এর সব কিছুরই কাঁচামাল আসত বাইরে থেকে। এইভাবে তারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে শিল্পে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিল। হল্যান্ড কোনও মেদিচি বা ফুগারের জন্ম দেয়নি। তারা উন্নতি করেছিল জাতি হিসাবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য—সব মিলিয়ে তারাই ছিল ইউরোপে সবচেয়ে অগ্রণী পুঁজিপতি। হল্যান্ড

ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের আগে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্স ও উত্তর ইটালিতে বস্ত্রবয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে সেখানে এক তীব্র শিল্প সংকট দেখা দেয়। ফ্লোরেন্সে এই সংকট আগেই, অর্থাৎ ষোড়শ শতকেই, সূচিত হয়েছিল এবং উৎপাদন অনেক কমে এসেছিল। সপ্তদশ শতকে এই ধারা অব্যাহত ছিল। মিলানে ১৬৪০ সালে তিন হাজার গাঁট কাপড় তৈরি হয়েছিল। ১৭০৫ সালে তা নেমে আসে মাত্র একশো গাঁটে। ভেনিসের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ ছিল। ইটালি তার চিরাচরিত উৎপাদনপদ্ধতি আঁকড়ে রেখেছিল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। এখানে বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পপুঁজিতে উত্তীর্ণ হয়নি; যেমনটি হয়েছিল, ধরা যাক, হল্যান্ডে। ইটালি তখনও উচ্চমানের এবং দামি পশম বস্ত্র উৎপাদন করত। পুরাতন গিল্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন সংগঠিত হত। কিন্তু গিল্ড ব্যবস্থা বাতিল হওয়া উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনের মধ্যে তখনও আবদ্ধ ছিল। দামি পোশাক তৈরি করা হত বলে উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছিল। কিন্তু চাহিদা বা ক্রেতার সংখ্যা কম ছিল। ফলে উৎপাদনও হত কম পরিমাণে। এর উপর ছিল বিভিন্ন ইটালি

Scanned with CamScanner

কর ও অভ্যন্তরীণ শুল্কের বোঝা। পশমও আমদানি করতে হত বাইরে থেকে (স্পেন)। এই অবস্থায় সে হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি।

স্পেন

স্পেনের অবস্থাও ছিল অনেকটা ইটালির মতো। অথচ স্পেনে শিল্প উন্নয়নের যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ ছিল। আমেরিকা থেকে সোনারুপো আসার ফলে পুঁজির অভাব ছিল না। শিল্পদ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদাও ছিল। এখানকার অনেক মানুষই ছিল ধনী ও সচ্ছল। তা সত্ত্বেও সে শিল্পে পিছিয়ে পড়ছিল। এখান থেকে ইংল্যান্ডে পশম রপ্তানি করা হত। অন্যদিকে সেভোগিয়াতে (Sevogia) দুই-তৃতীয়াংশ তাঁত বসে গিয়েছিল। আসলে এখানেও বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়নি বা তা করার খুব একটা সুযোগ ছিল না, কারণ স্পেন এই সময় বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল। ফলে বাণিজ্যিক পুঁজি সেভাবে গড়েও ওঠেনি। শহরগুলিতে গিল্ডের নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব কঠোর। গিল্ডগুলি উৎপন্ন দ্রব্যের মান, ডিজাইন বা নকশা ইত্যাদি সব কিছুই স্থির করত। সরকারও ছিল গিল্ডগুলির পিছনে। এই অবস্থায় নতুন কিছু করা বা উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ মোটেই সম্ভবপর ছিল না। দেশের দ্রব্যসামগ্রী বাইরে রপ্তানি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাইরের জিনিস অবাধে আমদানি করা হত। ফলে বাইরের প্রতিযোগীদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হয়নি। স্পেনের কর ব্যবস্থা ছিল শিল্পের বিকাশে আর একটি বড়ো প্রতিবন্ধক। স্পেন ক্রমশ বিদেশ থেকে আমদানি করা শিল্পদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সে কাঁচামাল রপ্তানি শুরু করে। স্পেনের জমজমাট শিল্প ও বাণিজ্যনগরী সেভিলের (Sevilee) পতন ঘনিয়ে আসে। আসলে স্পেন এই সময়ে সব দিক থেকেই পিছিয়ে পড়ছিল।

Scanned with CamScanner